Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501030 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Parimal Goswami's belles-lettres (Humourous Writing)
রম্য রচনায় পরিমল গোস্বামী

Tripti Sarkar
Researcher
Bengali Department
Kalyani University

Received on: 28th April 2026
Accepted on: 10th May 2026

Abstract:
A discussion of Parimala Goswami's essay or Ramyarachana raises some dilemmas. Because these essays can be called objective essay or Subjecticv Essay, but definitely not. In fact, he was also aware of the uniqueness of his story-telling style. He is mentioned in the author's own words in the book 'Purusher Bhagya'. Parimal Goswami is another prominent figure in Bengali literature. He has shown considerable skill in this genre. 'Magic Lanthan', 'Itashchet', 'Sapta Pancha' etc. essays on his poetry. According to Parimal Goswami, Ramyarachna is a special literary method of presenting the light, fleeting and varied events of life through witty conversation, humor and juicy prose. It is different from the scholarly or analytical essay, which is mainly a piece of prose with personal feelings, imagination and romantic description as the main focus. He thought that Ramyarachana is a high and juicy prose literature created on the trivial, common and everyday events of life. Rather than scholarly analysis, it is a light-hearted, humorous and satirical writing style that delights readers in the light of personal experience. Literature is created in juicy prose about the light, trivial or ordinary aspects of life, that is Ramyarachna. It has a chatty mood, humour, light-hearted tricks and in many cases sharp irony or sarcasm. To entertain the readers by avoiding the depth or seriousness of life and creating a kind of light yet enjoyable atmosphere.

Key Words:
Realism, literary sensibility, aesthetic richness, values, self-entertainment.

মূল প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে রম্য রচনা হলো লঘু-হাস্যরসাত্মক, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও বর্ণনাপ্রধান গদ্য সাহিত্য যা পাঠককে আনন্দ ও বুদ্ধিবৃত্তিক রস প্রদান করে। এটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিবর্তে কথ্যভঙ্গি, শ্লেষ ও কৌতুকের মাধ্যমে জীবনের খণ্ডচিত্র তুলে ধরে। রম্য রচনা বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় ধারা যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি দূর করে আনন্দ যোগায়। রম্যরচনা হলো হাস্যরস, কৌতুক এবং লঘু মেজাজে লেখা এক ধরণের সুখপাঠ্য গদ্য সাহিত্য। এতে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা জীবনের লঘু-চপল দিকগুলি সুন্দর, রসোত্তীর্ণ ও পরিমার্জিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়। এটি মূলত গম্ভীর বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিবর্তে পাঠককে আনন্দ ও বিনোদন দেওয়ার লক্ষ্যে রচিত হয়, যেমন — সৈয়দ মুজতবা আলীর ভ্রমণকাহিনি বা প্রবন্ধ। রম্যরচনা হলো লঘু-হাস্যরসাত্মক, ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্পনাময় গদ্য, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের বদলে সরস ভঙ্গিতে জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। একে 'রচনাময় প্রবন্ধ' বা 'রমণীয় রচনা' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। যা পাঠককে বিনোদন দেয়।

© Santiniketan Sahityapath

'রম্যরচনা' কথাটির অভিধানিক অর্থ যে রচনা রমণীয় বা সুন্দর। এই অর্থে রম্যরচনার সংজ্ঞা বিস্তৃত। কারণ সাহিত্যের ধর্ম যে তা রমণীয় ও সুন্দর হবে, হবে রসোত্তীর্ণ। আর এই অর্থে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সকল শ্রেষ্ঠ রচনাকে রম্যরচনা অভিধায় অভিহিত করা চলে। তবে রম্যরচনা বলতে বুঝি জীবনের লঘুচপল দিকগুলি নিয়ে যখন উচ্চতর কোনোভাবের প্রকাশ ঘটানো হয়। বলা যেতে পারে 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল' করা চিত্তের ক্ষণ প্রকাশ। এই ধরনের রচনার উদ্ভব ফরাসি সাহিত্যে। পরবর্তী কালে ইংরেজি সাহিত্যে এ ধরনের রচনার সৃষ্টি হয়। প্রবন্ধকারের মেধা ও বুদ্ধির ছাপ ছড়িয়ে পরে প্রবন্ধে আর রম্যরচনায়, ছড়িয়ে পরে হৃদয়ের পরিচয়ে। রবীন্দ্রনাথ রম্যরচনাকে বলেছেন 'বাজে কথা'... অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়, কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়মে 'অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে, যেমন বাজে খরচ তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। প্রমথ চৌধুরী রম্যরচনাকে বলেছেন — গুণপনাযুক্ত হ্যাবলামি।

বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত রম্যরচয়িতাদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যতম। সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'টুনি মেম'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোক রহস্য'। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন রম্যরচনা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। পরশুরামের 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন'। পরিমল গোস্বামীর মতে, এটি নিছক তথ্যমূলক লেখা নয়, বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া সাহিত্যিক রূপ, যা পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করে। তিনি আরো বলেছেন, রম্যরচনার মূল উপাদান হলো সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস। হালকা চালের বিদ্রুপ, শ্লেষ বা মজার মাধ্যমে পাঠককে হাসানো এবং একই সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে কোনো বিষয়কে তুলে ধরা হয়। গম্ভীর বিষয়কেও হালকা মেজাজে উপস্থাপন করা হয়। গুরুগম্ভীর বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের পরিবর্তে সহজ ও সাবলীল ভাষায় লেখা হয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের প্রাধান্য থাকে। রচনাটি অবশ্যই সুন্দর ও উপভোগ্য হতে হয়। বর্ণনার মাধ্যমে পাঠককে এক অন্য জগতে নিয়ে যাওয়া হয় যা রচনাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ভ্রমণকাহিনি, দৈনন্দিন ঘটনা বা সমাজ জীবনের অসংগতি নিয়ে লেখা হতে পারে। সহজে পড়া যায় এবং পড়তে ভালো লাগে, পাঠককে আনন্দ দেয়। ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য এর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, সামাজিক ঘটনা বা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে।

জীবনের গভীর বিষয়গুলোকে খুব সহজ ও হালকা চালে উপস্থাপন করা হয়। লেখকের নিজস্ব আড্ডা বা বৈঠকি মেজাজ এতে প্রাধান্য পায়, অনেকটা "familiar essay"র মতো। রম্যরচনার অন্যতম উপাদান হলো সূক্ষ্ম কৌতুক, পরিহাস ও বক্রোক্তি। এই ধরণের রচনায় জীবনের লঘু দিকগুলিকে নিয়ে উচ্চতর সাহিত্যিক বা সারস্বত কর্মে রূপ দেওয়া হয়। পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচিত্র বা রচনার ভঙ্গিতেও স্মৃতির চারণ, সরস কৌতুক এবং জীবনের লঘু অথচ উপভোগ্য অভিজ্ঞতার মিশেল দেখা যায়। রম্যরচনা, আভিধানিক অর্থে-রমণীয় বা সুন্দর রচনা। কিন্তু এ তো বেশ ব্যাপক সংজ্ঞা। সাহিত্যের যে কোনো শাখার রচনাই রমণীয় বা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। আর তখন যে কোনোটিকে রম্যরচনা নামে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। তা হলে বলতে হয়, এ এক স্বতন্ত্র ধরনের রচনা। উপন্যাস বা গল্পের সঙ্গে এর পার্থক্যটি হলো — উভয়ের মধ্যেই একটি কাহিনির বৃত্ত রয়েছে এবং সেই বৃত্তকে অবলম্বন করেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনিটি এগিয়ে চলে। এবং এই এগিয়ে চলা কাহিনির যেমন একটা বিজ্ঞান সম্মত শুরু আছে, তেমনি রসসম্মত সমাপ্তিও আছে। আসলে রম্যরচনার ক্ষেত্রে লেখক আমাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তত্ত্ব বা তথ্যের ভারে তিনি আমাদের বিড়ম্বিত করেন না। বৈঠকখানায় বসে আড্ডার মেজাজে অনর্গল আমাদের 'বাজে কথা' শুনিয়ে যান। তার মধ্যে ধার থাকলেও ভার নেই। প্রজ্ঞা থাকলেও দর্শন নেই। রম্যরচনার লেখক আমাদের আত্মীয় নন, গুরু নন, হিতৈষী নন — তিনি শুধু 'বন্ধু'। তাহলে অতি পরিচিত গল্প-উপন্যাস-কবিতা নয়, নয় গভীর ভাবনার গুরুভার তত্ত্বালোচনা, এ রচনা শুধু A Piece of nonsense এবং যে কোনো কিছুই এর বিষয় হতে পারে। এবং পরিমল গোস্বামীর এই রম্য রচনার মধ্যে 'ম্যাজিক লণ্ঠন', 'সপ্তপঞ্চ', 'ইতশ্চেত', 'রবীন্দ্রনাথ', 'বাঙালি', 'বাংলাভাষা ও নানা নিবন্ধ', 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' এবং 'রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি সকল গ্রন্থই আলোচনার দাবি রাখে। গ্রন্থটি বিহার সাহিত্যভবন লিমিটেড থেকে প্রকাশিত হয়। এবং উৎসর্গ করা হয়েছিল পরিমল গোস্বামীর 'সাহিত্যসীমানাত্যাগী সুহাদ' শ্রীকিরণকুমার রায়কে। ফরাসী লেখক লেআঁ-পোল ফাস্ট রচিত বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ 'দি ম্যাজিক ল্যান্টার্ন'এর অনুসরণে এ গ্রন্থের নামকরণ। এই বইখানিও এক বিচিত্র রস রচনা। 'মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না কেন', 'রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ', 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি' রচনা সম্বন্ধে লেখকের ভাষা — 'আমার এই বইতেও মাত্র তিনটি চারটি গুরুবিষয় অবতারণার জন্য কুড়ি-বাইশটি

© Santiniketan Sahityapath

হাল্কা গানের রেকর্ড বাজাতে হয়েছে...'। কথাটা সত্য। 'রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ', 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি' রচনাগুলি যথেষ্ট সিরিয়াস। বিশেষ করে 'রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ' শিল্প বা আর্ট-এর তত্ত্বগত আলোচনা দিয়ে শুরু। কিন্তু ক্রমশ দেশি-বিদেশি শিল্পী, তাঁদের ছবির (নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথ, মুকুল দে, র‍্যাফেল, পিকাসো, রুশ শিল্পী লাকটিওনফের এবং ই. ই. কেলেট ও তাঁর গ্রন্থের The Whirligig of Taste) উল্লেখে সত্যিই প্রবন্ধটি গুরুভার। চিত্রশিল্প বিষয়ক এই আলোচনা স্মরণ করিয়ে দেয় একদা পরিমল গোস্বামী শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র ছিলেন। 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি' বা 'রবীন্দ্রনাথের নৌকায়' রচনা দুটিতে সহজ বক্তব্য ও বর্ণনা, কিন্তু স্বভাবসুলভ কৌতুকের ছোঁয়া প্রায় নেই। 'প্রায়' বললাম কেন বুঝবার জন্য সামান্য উদ্ধৃতি — "গতকাল শিশিরকুমার এসেছিলেন আমার কাছে। যাবার সময় দরজার বাইরে গিয়ে বললেন, 'না, স্পষ্ট মনে আছে, আনিনি'। তাঁকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি তাঁর লাঠিখানা আমার ঘরে পড়ে আছে।" যদিও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন তবু বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তিনি যখন মাস্টারমশাই তখন তাঁর বিষয়ে এর চেয়ে বেশি আর কতটা লেখা যায়। এখানেই পরিমল গোস্বামীর কৃতিত্ব, এই স্নিগ্ধ সরস স্বাভাবিকতায়। 'রবীন্দ্রনাথের নৌকায়' তো চন্দননগরের সাহিত্য সম্মেলনকালীন সময়ের সনিষ্ঠ বিবরণ। 'জাগিল কি ঘুমালো সে' মৃত্যু চিন্তা বিষয়ক প্রায় এগারো পাতার 'দার্শনিক' প্রবন্ধ। এছাড়া অপরাপর রচনাগুলি যথারীতি সামাজিক বা রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি-অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আঘাত। এবং নাম-প্রবন্ধটি এদিক থেকে তুলনাহীন প্রায়, কারণ অর্ধশতাব্দী আগে (১৯৫০এ রচিত) প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য আজও হুবহু এক।

আবার সিরিয়াস বিষয়ের সঙ্গে বিশুদ্ধ হাস্যরসসমৃদ্ধ রচনাও কম নেই। বরং অনুরূপ রচনাই বেশি। 'হাসির উপকরণ' থেকে একটি উদ্ধৃতি — "পাড়া গাঁয়ের এক থিয়েটারে অভিনয়দৃশ্য পরিবর্তনের সময় নারদের দাড়ি সীনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। সীনের দড়িতে যত টান পড়ে নারদও তত ঘাড় উঁচু করতে থাকেন — কিন্তু অ্যাক্টিং থামান না। শেষ পর্যন্ত দাড়ির মায়া তাঁকে ছাড়তেই হলো এবং পরে অভিনয়ের মায়াও ছাড়তে হলো, কারণ দর্শকরা ততক্ষণে হাসতে হাসতে উন্মাদ হয়ে উঠেছে।" "এই জাতীয় অসঙ্গতি এবং নির্বুদ্ধিতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের জীবন থেকে চলে যাবে, আমরা আদর্শ মানুষ হব, একথা যে বলে তার প্রতি নজর রাখা দরকার কারণ তার অসাধ্য কোনো কাজ নেই।" বিষয় এবং ব্যাখ্যা যথার্থই অভিনব এবং শিক্ষাপ্রদ। অন্যান্য রচনার মতো পরিমল গোস্বামী রম্য রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বেশ কয়েকখানি রম্য রচনা লিখেছেন। 'ম্যাজিক লণ্ঠন', 'ইতশ্চেত' প্রভৃতি তাঁর রম্য রচনা। 'ম্যাজিক লণ্ঠন' প্রবন্ধ সংকলনের প্রবন্ধগুলি হলো 'মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না কেন', 'রবীন্দ্র শিল্পপ্রসঙ্গ', 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি' ইত্যাদি।

প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র শিল্প প্রসঙ্গে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রম্য রচনা সংকলন হলো 'ম্যাজিক লণ্ঠন'। 'ম্যাজিক লণ্ঠন' প্রবন্ধ সংকলনের একটি 'প্রবন্ধ রবীন্দ্র শিল্প প্রসঙ্গে'। প্রবন্ধটিতে আর্ট সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেই আলোচনা খুবই বিশ্লেষণ মূলক। এরপরে তিনি আলোচনা করেছেন বিভিন্ন দেশে-বিদেশের মনীষীদের চিত্র নিয়ে। দেখিয়েছেন সেই ছবিগুলি কীভাবে সাধারণ থেকে আর্ট বা শিল্প হয়ে উঠেছে। এরপরে তিনি রবীন্দ্র আর্ট বা শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মনের খেয়ালে কাটাকুটি করতে করতে ছবি একে ফেলতেন তারই বিশদ আলোচনা রয়েছে প্রবন্ধটিতে।

'রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটিতে তিনি ভূমিকাতে দেখিয়েছেন আর্ট কী। কোনো আর্ট বা শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার আর্ট আসলে কি? মানুষ তার নানা প্রদর্শনীতে যেসব পেন্টিং বা চিত্রশিল্প দেখে, তার মধ্যে অনেক ছবি যা আমাদের পরিচিত প্রাণী বা অন্য কোনোজিনিসের নিখুঁত চিত্র, আবার এমন অনেক ছবি দেখে যা পরিচিত প্রাণী বা বস্তুর আভাস মাত্র বহন করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন আধুনিক চিত্রের প্রতিলিপি দেখে যা শুধু নানা বিচিত্র রেখা ও বর্ণের সুন্দর বিন্যাস মাত্র, তাতে পরিচিত জগতের কোনো বস্তুর কোনো আভাস নেই। কিন্তু কেন এমন হয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে এরকম বিভিন্নতা কেন? এর উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, পরিচিত হোক অপরিচিত হোক বা অল্প পরিচিত হোক শিল্পী যে রূপই গড়েন আর্ট এর ক্ষেত্রে তারই একটা নিজস্ব দাবি আছে। সেই রূপটি কিছু সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক, রেখা বা বর্ণবিন্যাসে তা কোনো একটি নির্দিষ্ট আকার যদি পায় তাহলে তাকেই আর্ট বলে মেনে নিতে হয়। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাকে চোখের সামনে অব্যাহত ভাবে দেখা যায়। অতএব তা সত্য, আর যা সত্য তাই হলো আর্ট। এই আর্ট সৃষ্টি করতে একটা চেহারা গড়তেই হয় তা পরিচিত জিনিসের অনুকরণ হোক বা খেয়ালি কতগুলি আকৃতি হোক, আর্ট সৃষ্টিতে যে-কোনো একটি অনিবার্য। এই চেহারা সম্পূর্ণ মন থেকে করা হলেও তাকে অস্বীকার করার

© Santiniketan Sahityapath

উপায় নেই, যদি তা আমাদের চোখকে তৃপ্তি দেয়। প্রকৃতির বুকে মানুষ একটা স্থান পেয়েছে নিজের চেহারার জোরে। এর ফলে মানুষ আর অন্য কিছুর সঙ্গে মেলে না বলে আমরা দুঃখ পাই না। কারণ মানুষের নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে। প্রকৃতির বুকে দৃশ্যমান সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ বা বস্তু সম্পর্কে এই কথাই খাটে। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে যেখানে সৃষ্টির পেছনে রচয়িতার একটা নিজস্ব সচেতন মন কাজ করে। সেখানে তার গড়া যে-কোনো খেয়াল প্রসূত রূপ বা আকারকে আর্ট বলা যায় না। যে-কোনো বিশুদ্ধ আকার বা রূপ যদি আর্ট হতো তাহলে যান্ত্রিক অথবা জ্যামিতিক ডিজাইনও আর্ট হতো। মানুষের সৌন্দর্যবোধ ডিজাইনে যেটুকু তৃপ্তি লাভ করে তা অগভীর। কেননা আর্টে মানুষ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেতে চায়। একটি গাছ দেখতে কেমন বা একটি পাখি দেখতে কেমন তা যে কোনো নিপুণ কারিগর এঁকে দেখাতে পারেন। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায় না। এরকম ছবিকে আজ ছবি বলা যায় না। এরকম ছবি উদ্ভিদ তত্ত্ব বা প্রাণী তত্ত্ব বীদের কাজে লাগতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ ঘটে না। গাছ বা পাখি শিল্পীর উপলক্ষ্য মাত্র। শিল্পী নিজের মনের বিশেষ একটা ভাব বা কল্পনা এসবের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে থাকে। অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বকেই প্রকাশ করে। প্রত্যেক ছবিতেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে এবং সে ছবি অন্য কোনো ছবির সঙ্গে মেলে না। সাধারণত দেখা যায় এক একটা জাতির মধ্যে শিল্পরূপের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গি গড়ে ওঠে। জাতের চরিত্রের সঙ্গে মিলে যায়, এতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে না তবুও মোটের উপর একটা মিল থাকে। একটা জাতির মানুষের মধ্যে তাদের চেহারায় মিল থাকে অথচ প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বতন্ত্র। মানুষের পরিচিত ভঙ্গির কোনো ছবি আঁকলে মানুষ তাতে সহজে আকৃষ্ট হয়, তাতে যেন একটা আরাম বোধ করে। আবার শুধু জাতি নয়, একটা সময়েও একটা ভঙ্গের জন্ম হতে পারে। প্রথমেই তা হয়তো জনপ্রিয় হয় না, কিছুকাল পড়ে জনপ্রিয় হয় অথবা তারা আয়ু বেশি দিন থাকে না। অর্থাৎ নতুন কোনো ভঙ্গি কোনো যুগের পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে সেটি যে চিরস্থায়ী হবে এমন কোনো কথা নেই। আবার সে সঙ্গে পুরনোটিও বাতিল হয়ে যাবে এমনও কোনো কথা নেই। ক্ষমতাবান শিল্পী যে ভঙ্গিতে নিজেকে বেশি প্রকাশ করতে পারেন বলে মনে করেন সেটাতেই তিনি লেগে থাকেন। এর মধ্যে কোনো অযৌক্তিক কিছু নেই, অন্তত এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। শিল্পের কোনো রূপ মাধ্যমকে চরম বলে মানা উচিত নয়। জগতে চরম বা absolute বলে কিছু নেই। জীবনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন সবসময় কাজ করে। এই আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনই হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা। এই প্রেরণা না থাকলে আর্টের প্রশ্নই ওঠে না। আর্ট সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী আরো বলেছেন — ''অনেকের ধারণা আর্টে শুধু আলোছায়া বিন্যাস জাত সৌন্দর্য থাকলেই যথেষ্ট। আইতে তার বেশি আর কিছু চাই না। কিন্তু সুন্দর্যতত্ত্ব ও দর্শক মনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে কথাটা আংশিক সত্য মাত্র। সম্পূর্ণ সত্য হলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। আর্ট সম্পর্কে দর্শকের মনোভাব ব্যাখ্যায় অনেকখানি অংশ বাদ পড়ে যায়, এতে ফর্মের প্রাধান্য দেয়া হয়। অনেকটা আধেয় অপেক্ষা আধারের প্রাধান্য দেওয়ার মতো হয়। শিল্পে অবশ্য আধেয় থাকতে গেলে আধার থাকতেই হবে, কিন্তু আধার থাকলে আধেয় নাও থাকতে পারে। যথার্থ শিল্পীর হাতে ও দুটি অবিচ্ছেদ্য সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য।''[১]

সাধারণত আর্ট বিশ্লেষণে দুটি পৃথক রীতি দেখা যায়। একটি হলো শিল্পীর কলাকৌশল আর একটি হলো শিল্পীর বাণী ও তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পরিমল গোস্বামী নন্দলাল বসুর জন্মাষ্টমী ছবিটির বিশ্লেষণ আলোচনা করেছেন। নন্দলাল বসুর জন্মাষ্টমী ছবিতে দেখা যায় বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিয়ে রাত্রিবেলা ঝড়ের মধ্যে রওনা হয়েছেন নন্দালয়ের উদ্দেশ্যে। বসুদেবের মনের সমস্ত ভয় সন্দেহ ব্যাকুলতা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দ্বিধা অথচ দৈবের প্রতি একান্ত ভরসা — এ সমস্ত ভাবটি তীক্ষ্ণ এবং ঘনীভূত হতে দেখা যায় বসুদেবের চোখে মুখে যা ছবিটিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কারাগারের বাইরে দুর্যোগময়ী প্রকৃতি এবং পশ্চাতে দেবকীর নিষ্পলক প্রশান্ত প্রার্থনা এই ভাব সমষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বসুদেবের মুখের ছবিটি শুধু থাকলেই শিল্পীর মূল রূপ ছবিতে প্রকাশ হতে পারত। কিন্তু শিল্পীর সঙ্গে কিছু পরিমাণ সংবাদ যুক্ত করে ঝড়ের মধ্যে একটি পিতার সদ্যজাত সন্তান-সহ অসহায় যাত্রা না দেখিয়ে, বসুদেব-রূপ বিশেষ লোকের কাহিনিটি চিত্রিত করেছেন। এই কাহিনি ঘিরে বহু কাল থেকে মানুষের মনে যে সেন্টিমেন্ট আছে সেটিও এ ছবি দেখলে জেগে ওঠে। শিল্পী এই সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে যা আঁকতেন তাতেই হয়তো মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তিনি ছবির যে নিজস্ব মূল্য আছে তা কিছু মাত্র কমান নি। অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর কাহিনি যিনি জানেন না তাঁর কাছেও এ ছবির মূল্য কিছু মাত্র কম নয়। বসুদেবের দেহের ভঙ্গিতে, চোখের চাহনিতে ঊর্ধ্বমুখীন অপার্থিব দৃষ্টিতে একটি নারীর নির্বাক প্রার্থনাই শিল্পী তার নিজের অনুভূতি এই ছবিতে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে — ''মূর্তি গুলি যদি পরিচিত মানুষের বাস্তব অনুকরণ হতো তাহলে শিল্পী তাঁর কল্পনা, রূপায়িত করতে অবশ্যই বাধা পেতেন। বিভিন্ন ভঙ্গিতে অঙ্কন পটু শিল্পী তার এই বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করবার জন্য এই বিশেষ ফরমটি এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেছেন।''[২]

তিনি আরো দেখিয়েছেন শিল্পের এই ফর্মটি প্রকট করার জন্য রাফেল মাতৃভাব ফোটাতে ম্যাডোনাকে তার পরিবেশ সমেত স্বাভাবিক মানুষ করে গড়েছেন। যামিনী রায় মাতৃভাব ফোটাতে তাঁর মাতৃ-মূর্তিতে মাত্র গোটা কতক রেখা ব্যবহার করেছেন। রাফেলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটি সেন্টিমেন্ট আছে সেটি হলো রোমান ক্যাথলিক সেন্টিমেন্ট। যেখানে মাতৃস্নেহের কোমল ভাবটি ফোটানোই উদ্দেশ্য, সেখানে সেই বিশেষ ভাবটির বাহন হিসেবে স্থান ও কালের অতীত ন্যূনতম রেখা বা বর্ণই অধিকতর উপযোগী একথা বলা বাহুল্য। মাতৃস্নেহ একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাব হলেও অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ আছে। যামিনী রায় অ্যাবস্ট্রেক্টের দরজার বাইরে বসে আছেন, সুতরাং চিত্রশিল্পের সীমানার মধ্যে আছেন। তিনি যদি ওই প্রান্ত থেকে পুনরায় পিছিয়ে আসতেন তাহলে তাঁর মাতৃস্নেহ আর শুধুমাত্র মাতৃস্নেহ থাকত না, তা ক্রমশই রাম শ্যাম যদু মধুর মায়ের স্নেহ রূপে দেখা দিত। এখানে প্রকৃত শিল্পীর আর্টের যথার্থতা।

প্রাবন্ধিক পরিমল গোস্বামী রুশ শিল্পী লাকটিওনফের 'এ লেটার অফ দি ফ্রন্ট' ছবিটি আলোচনা করেছেন। ছবিটিতে রয়েছে চিঠি, জনতা অবান্তর কিন্তু সূর্যের আলোকের বাণী ফুটিয়ে তোলার জন্য এগুলি অপরিহার্য সহায়ক রূপে ছবির ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। সূর্যের আলো শিল্পীর আবেগকে চঞ্চল করে তোলে, তার মন ভাস্বর হয়ে ওঠে, আলোর প্লাবনে যেন তিনি ডুবে যান। আলোর এই রূপ তিনি তার ছবির ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই আলোর বাণী প্রকাশিত হয়েছে অতুল বসুর একখানি ছবিতে, সেখানেও মানুষের মুর্তিকে ঝাঁপিয়ে উঠেছে সূর্য লোকের মাধুরী। এই দুটি ছবিতেই আলো সূর্যের আলোর রিপ্রেজেন্টেশন নয়, দেখার সময় মনেও আসে না যে সূর্যালোকের ফটোগ্রাফি এটা। জন্ম জন্ম সাধনা করলেও ক্যামেরার আলো এ বাণী ধরতে পারবে না। আলো যে আবেগ জাগিয়ে ছিল শিল্পীর মনে তা ফোটাবার জন্য পরিবেশে মানুষের স্বাভাবিক চেহারা অপরিহার্য নয় অবশ্যই, কিন্তু স্বাভাবিক চেহারা থাকাতেও কোনো ক্ষতি নেই। সেই মুহূর্তগুলি তো ছবির মর্মবাণী নয়, বরং মর্মবাণী তাদের অতিক্রম করে আলোর মতোই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছে। তাই সকল ক্ষেত্রে একমাত্র ভঙ্গির প্রশ্নই বড়ো করে দেখতে গেলে শিল্প বিচারে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। শিল্পীকে ভুলে, তার ব্যক্তিত্বকে বাণীকে ভুলে, এইভাবে শুধু টেকনিক ইত্যাদি নিয়ে বিচার করলে শিল্প উপভোগ বাধার সৃষ্টি হয়। পরিবেশে পরিচিত বিষয়বস্তু রেখেও যিনি আলোর মর্ম বাণী ফোটাতে পারেন, তাঁকে মানুষ বড়ো শিল্পী বলে মনে করে। আবার যিনি পরিচিত মূর্তির উপর নিজের ফর্ম আরোপ করে বাস্তব মূর্তিকে পরিবর্তন করে, ওই একই আলোর মর্ম বাণী সার্থকভাবে ফোটান তাঁকেও মানুষ বড়ো শিল্পী বলে। দুজন শিল্পীর ছবি পৃথক কিন্তু ছবি দুটির উদ্দেশ্য এক। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য বড়ো শিল্প গড়ে উঠেছিল ইউরোপে, তাতে বাস্তবধর্মিতা ও বাণী উভয়ই ছিল। আজো তা বড়ো আর্ট বলে স্বীকৃত। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে যে আর্টের সৃষ্টি হয়েছিল তা সর্বত্র বাস্তবধর্মী ছিল না, কিন্তু তাতে শিল্পীর কল্পনা প্রকাশে বাধা হয়নি। যুগও সমস্যা বা যুগ মনোভাবের সঙ্গেও অনেক সময় শিল্পের রূপান্তর ঘটে। দেশভেদেও ঘটে একথা বলা যায়। হয়তো সকল দেশের ঘটে না। আমাদের দেশে রূপান্তর ঘটানো ইউরোপের চেয়ে বেশি কঠিন। যিনি রূপান্তর ঘটাতে যাবেন তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। আবার পরিমল গোস্বামী মহাভারতের শৈল্পিক ভাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। মহাভারতের বিশাল পটভূমিতে অজস্র চরিত্র সৃষ্টি করে কবি মূলত যা বলতে চেয়েছেন তা হয়তো তাঁর একটি ছোট্টো কবিতায় বলা যায়। তাহলে মহাভারতকে মহাভার রূপে পরিত্যাগ করে একটিমাত্র কবিতাকেই মহাভারতের সবচেয়ে বড়ো বলে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু আমরা তা করি না। মহাভারতের ফর্মকেও আমরা আর্ট বলে স্বীকার করি। শিল্পীর প্রয়োজন কত দুটি ফর্মই সাহিত্য বিচারে সত্য বলে মানা হয় তুলনা করার প্রয়োজন হয় না। কেউ বলে না যে মহাভারতের কবি অতগুলো বাস্তব চরিত্রের অকারণ দাসত্ব করেছেন। গুরুগম্ভীর দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পী অনায়াসে নিজের বক্তব্য বলতে পারেন একটি গীতিকবিতার ভেতর দিয়ে। দুই এর প্রয়োজন ভিন্ন নিজে নিজে প্রয়োজনের দাবিতে দুই-ই সত্য। দুটি স্বামী শিল্পীর আধার হতে পারে।

এরপরে প্রাবন্ধিক পরিমল গোস্বামী নাম প্রবন্ধের বিষয় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা নিয়ে, তত্ত্বগতভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে মনোগ্রাহী পর্যালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী বলেছেন — "রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বিশুদ্ধ ফর্মে আকৃষ্ট হন। রেখা টানতে টানতে একটা কিছু হয়ে ওঠাই তাঁর আনন্দের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে অর্থহীন এলোমেলো রেখা, তার চোখকে পীড়িত করেছিল তার সঙ্গে আরও কতগুলি রেখা জুড়ে দিলেই তা যে চোখের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক একটা চেহারা পায় এবং আরও কিছু যোগ করা মাত্র তা ভেঙ্গে যায় এর মধ্যে দিয়ে তিনি একটি বড়ো সত্য দেখতে।"[৩] রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির রীতি খুঁজে নিয়েছিলেন। প্রকৃতিতে অবিরাম যে ভাঙা গড়ার কাজ চলছে, এক গ্রুপ ভেঙে আর একরূপ ফুটে উঠেছে তাই দিয়ে তিনি শিল্পের আকার

দিয়েছেন। এই আবিষ্কারের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে এক অদ্ভুত আনন্দ দিত। কল্পনা ও অনুভূতির পথে তিনি এ সত্য কবি জীবনের গোড়াতে উপলব্ধি করেছিলেন। ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন, রূপ হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা কী করে হয়। এরপর থেকে তিনি রূপ গড়া আর রূপ ভাঙা এবং আবার রূপ গড়ার আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। এতে তিনি বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে এক নতুন পথে আতিথেয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মনে জেগে উঠেছিল অভূতপূর্ব এক আনন্দ। এই আনন্দের বাণী আছে তাঁর চিত্রশিল্পে। তিনি নিজে বলেছেন ''যেমন আমার ছবি আঁকা তেমনই আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোট বড়ো যেসব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম।'' চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ কোনো ঘটনা বা রূপকে মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেতেন, চারিদিকের কোনো কিছু সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক বা না থাক তার ভেতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙ্গা গড়া, চলাফেরা, জোড়া তারা চলত। কিছু ভাব কিছু বা ছবি নানা রকম চেহারা তাঁর সামনে প্রস্ফুটিত হতো তার সঙ্গে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের ছিল কলমের কারবার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকাশে বাতাসে যেখানেই চোখ মেলতেন সেখানেই তাঁর কাছে শিল্পের জগৎ ধরা দিত। গাছপালার দিকে তাকিয়ে তিনি উপলব্ধি করতেন জগৎটা শিল্পের এক মহাক্ষেত্র। রবীন্দ্রশিল্পের মধ্যে সবসময় এক আনন্দময় আবহ ধরা পড়ে। এই আনন্দ রহস্যের বাণী বহন করে রবীন্দ্রশিল্প। পরিমল গোস্বামীর মতে আকস্মিকভাবে ভাবে চেতন মনের বাইরে বিশ্ব প্রকৃতিতে যে রূপ প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয় তা আর নয়। অজ্ঞান শিশু যে হিজিবিজি লাইন কাটে, তা দৈবাৎ যদি ছবি হয়ে ওঠে তবু তা আর্ট নয়। আর্ট হতে গেলে একটা সচেতন মন লাগে। শিল্পী রবীন্দ্র তার ব্যতিক্রম হন নি। 'রবীন্দ্র শিল্প প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিল্পের গূঢ় তত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছে পরিমল গোস্বামী যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যথার্থ মূল্যের দাবি রাখে।

পরিমল গোস্বামী আরেকটি প্রবন্ধ 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি' ১৯৫৪ সালে লেখা। প্রবন্ধটিতে নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং সুদক্ষ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ি কীভাবে নাট্য অভিনয়ে এলেন, অভিনয়ের সঙ্গে নিজেকে কীভাবে একাত্ম করে নিয়েছিলেন, কতটা শৈল্পিক মানুষ ছিলেন, ব্যক্তি হিসেবে কী রকম ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি — তার এক সুখগ্রাহী আলোচনা করেছেন পরিমল গোস্বামী। শিশিরকুমার ভাদুড়ি সম্পর্কে কেন লেখায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তা প্রাবন্ধিক নিজেই জানিয়েছেন — ''শিশিরকুমার সম্পর্কে আমার দায়িত্বের বোঝা আরো হালকা করে দিয়েছেন প্রাণতোষ ঘটক। আমাকে জীবনী লিখতে বলেননি, বলেছেন আমার ইমপ্রেসন লিখতে, অর্থাৎ আমি যে চোখে শিশিরকুমারকে দেখেছি। আমার এই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তর্কের অবসর নেই, অতএব আমি নিরাপদ।''[৪] নাট্য অভিনেতা শিশিরকুমার ছিলেন একজন শিক্ষক, কলেজের শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি মঞ্চেও শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রতিভা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগে তিনি ছিলেন শিক্ষক অন্য ভাগে তিনি ছিলেন শিল্পী। আবার শিল্পী শিশিরকুমারেরও দুটি দিক আছে। এক দিকে তাঁর প্রয়োগকুশলতা যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং মৌলিক আর একদিকে তিনি তাঁর পরিকল্পিত নাটকের নায়ক। শিশিরকুমার ভাদুড়ির যে নাট্য পরিকল্পনা তা চিত্রপরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ক্যানভাসের ছবি আঁকার বেলায় শিল্পী যতখানি ক্ষেত্র পান তার সমস্ত অংশে সমান মনোযোগ দিতে হয়। ছবির প্রধানকে ফোটাতে তুচ্ছতম আলো ছায়া বা বস্তুবিন্যাসে একান্ত মনোযোগ না থাকলে ছবি ব্যর্থ হয়। শিল্পী প্রধান দর্শনীয় স্বার্থে অপ্রধানের দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন। অর্থাৎ তাঁর সমগ্র চিত্র পরিকল্পনায় কোনো অংশই অবহেলিত থাকার উপায় নেই। শিল্পী শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই শিল্পধর্ম অনুসরণ করেছিলেন বলেই তাঁর নির্দেশনায় নাটক এমন অভিনবত্বের স্বাদ বয়ে এনেছিল। সীতা নাটকের পরিকল্পনায় এই অভিনবত্ব প্রথম দেখা যায়। তৎকালীন সময়ে বাঙালি দর্শক উন্মাদ হয়ে উঠেছিল তাঁর এই নাট্য পরিকল্পনা দেখে। সাধারণ বাঙালি যে-কোনো ব্যাপারে চট করে উন্মাদ হয়। কিন্তু শিশিরকুমারের অভিনয়-কৌশল ও প্রয়োগ-কৌশলে এমন কিছু অসাধারণ একটা ছিল, যাতে সমস্ত বাঙালির ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তাঁর প্রতি উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল। সেই উন্মাদনা ছিল অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদনের উন্মাদনা সীতা নাটকে রাম-উচ্চারিত, ''কার কণ্ঠস্বর'' এই ধ্বনির মধ্যে দিয়ে সেদিন সমস্ত বাঙালি শিশিরকুমারের কণ্ঠস্বরই শুনতে যেত থিয়েটারে।

প্রবন্ধটিতে আরেক জায়গায় আলোচিত হয়েছে শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয় দক্ষতা প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, ''কোনো নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে নিজেকে না মিলালে শিশিরকুমারের অভিনয় করতে কষ্ট হয়।''[৫] যখন পূর্ণ শক্তি ছিল তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ি ভাস্কর যেমন অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে অমূর্ত পাথর কেটে মূর্তি মূর্তি গড়েন তেমনি উৎসাহের সঙ্গে তার মনের মতো নতুন শিল্পী গড়ে তুলেছিলেন। প্রাবন্ধিক পরিমল গোস্বামী পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও শিশিরকুমার ভাদুড়িকে সৌখিন শিল্পীদের

সঙ্গে উদ্যমে রিহার্সাল পরিচালনা করতে দেখেছেন। অভিনেতা শিশিরকুমার যে নাটকে অভিনয় করতেন তা সমগ্রভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন না হলে তাঁর মধ্যে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতেন না। তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "যে যা খুশি পার্ট দিক, যেভাবে বলতে বলে বলুক, এই শর্তে রাজি হলে, আমার ধারণা তিনি সিনেমা থেকে প্রচুর টাকা আয় করতে পারতেন। কিন্তু এ কাজ তাঁর মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে খারাপ খায় না বলে মনে করেন নি। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।"[৬] শিশিরকুমার ভাদুড়ি টাকার অভাবে তাঁর অনেক পরিকল্পিত নতুন নাটক মনের মতো প্রয়োগ করতে পারেন নি, তবু তিনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করেন নি। বহু দুঃখ এবং আঘাতের মধ্যে দিয়েও তিনি এই একটি বিষয়ে অর্থাৎ যেখানে তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী শিল্পী সেখানে তিনি টাকার লোভে নিজের আদর্শকে বিসর্জন দেননি। আধুনিক সিনেমার রুপালি প্রলোভনের মুখে দাঁড়িয়ে স্বধর্ম বজায় রাখা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

নাট্য অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ি ছিলেন মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অধ্যাপকরূপে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার ছিল তাঁর অতি মধুর। সর্বদা হাসি খুশি মুখ কৌতুকপ্রিয়তা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি ছিলেন জাঁকজমকহীন একজন মানুষ। তাঁর সম্পর্কে তিনি কোনো প্রচার পছন্দ করতেন না। তাঁকে অভিনন্দন দেওয়া বা মানপত্র দেওয়া ইত্যাদি প্রস্তাব শুনলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়তেন, তাকে রাজি করানো কারো পক্ষে সম্ভব হতো না, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনমনীয়। নাটক বা নাট্য সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী শ্রোতা পেলে আলোচনা করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাঁর বন্ধুবাৎসল্য ছিল অপরিসীম। এবং তিনি ছিলেন খুবই বইপিপাসু একজন মানুষ। সময়ের জ্ঞান, দায়িত্ব কর্তব্যবোধ তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। শেষ বয়সে এসে তুমি প্রবল নিদ্রাহীনতায় ভুগতেন। সেই সঙ্গে হারিয়েছিলেন স্মৃতিশক্তি। কিন্তু তাঁর মধ্যে তবু মনের জোর ছিল, অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি যদি কোনো নাট্য আলোচনা বা অভিনয়ের রসদ পেতেন, তাহলে তাঁর সমস্ত শারীরিক অসুস্থতা ভুলে তিনি সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে উঠতেন। এখানেই বোধ হয় একজন শিল্পী। স্মৃতিশক্তি যে শেষ বয়সে এসে অনেকটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল সেই বিষয়ে পরিমল গোস্বামী তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। একদিন শিশিরকুমার ভাদুড়ি তাঁর বাড়িতে এসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। যাবার সময় তিনি বলেছিলেন আমি বোধহয় একটা লাঠি এনেছিলাম। আবার একটু পরেই তাঁর মনে হয়েছিল তিনি হয়তো লাঠি আনেন নি।

পরিমল গোস্বামী রচিত রম্যরচনা মূলক এক অন্যতম প্রবন্ধ হলো মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না কেন। শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় এই উত্তেজনাপূর্ণ গুজবটি আজকের নয় অনেকদিন থেকেই সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তবে বিষয়টি সত্য কিনা তার কোনো বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা আজো হয়নি। মেয়েরা যে কথা গোপন রাখতে পারেনা এই গুজবটি কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, এই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদেশিরাও অনেকটা একমত। এ বিষয়ে এক ইংরেজ রসিক ব্যক্তি বলেছেন মেয়েরা কখনো ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখতে পারে না। কেননা তারা উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই অপরাধীর নাম প্রকাশ করে, আবার অনেকে তো প্রথম প্যারাগ্রাফেই। এ বিষয়ে কেবলমাত্র প্রতিপক্ষের কথাই যে পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়। প্রতিবাদ মূলক কথাও কিন্তু দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। কেননা ডিটেকটিভ উপন্যাস সম্পর্কে প্রধান প্রতিবাদ হচ্ছে শ্রীমতি অ্যাগাথা ক্রিস্টির পঞ্চাশখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস। এ বিষয়ে তিনি অনেক পুরুষ লেখককে হার মানিয়েছেন। তাঁর লেখায় অপরাধীর নাম শুধু যে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে তা নয়, এমন ভাবে গোপন থাকে যে শেষ অধ্যায় পৌঁছানো পর্যন্ত অনুমান করা অসম্ভব। আবার আমাদের দেশে যেসব মেয়ে স্বাধীনতার জন্য এককালে লড়াই করেছেন তাঁরাও কখনো গোপন কথা শত্রুদের কাছে প্রকাশ করেন নি। যারা করেছে তারা বিপরীত সম্প্রদায়ের।

অনেকেই বলবে মেয়েরা নিজের কথা গোপন রাখতে পারে অন্যের কথা পারে না। মেয়েরা যে নিজের কথাটি গোপন রেখে অন্যের কথা প্রকাশ করে, এটি তারা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর কাছ থেকে পেয়েছে। প্রকৃতিও তার আসল সত্যটি প্রকাশ করে না, বাইরে বাইরেই অনেক কিছু প্রকাশ করে থাকে। তবে মেয়েদের সম্পর্কে শুধু কথা প্রকাশ করা নয়, ব্যথা প্রকাশ করা সম্পর্কেও অভিযোগ আছে। মেয়েদের হৃদয় এমন ধাতুতে গড়া যাতে কথা বা ব্যথা যাই হোক যদি সমান উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাহলে তাদের হৃদয়ে কোনো কিছুর স্থান পায় না, সব কিছু উজাড় করে দেয়। এটাই হলো সাধারণ নিয়ম। তবে এ বিষয়ে পুরুষরাও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। মেয়েদের হৃদয় যখন উত্তেজিত হয় তখন তাতে আলোড়ন হয় অত্যন্ত বেশি। যে-কোনো বেদনা বা যে কোনো সরস গোপন কথায় মেয়েদের হৃদয়ে সমুদ্রমন্থনের ক্রিয়া শুরু হয়। আর তার ফলে ভেতর থেকে একে একে সব বেরিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ আঘাত পেলে তাই তারা যেমন অস্থির হয়, যেমন চিৎকার করে কাঁদতে থাকে কিন্তু পুরুষদের বেলায় সেরকম হয় না। হঠাৎ আঘাত মেয়েদের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা করা তাদের কাছে সহজ হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ বেদনাকে

তারা পুরুষের মতো মনের বাইরে বিস্তার করে ধরতে পারে না তার সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করতে থাকে। ব্যথা ও কথা দুই তাদের হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধে যায়। তারপর হয় সে কাঁটার কাছে ষোল আনা হার মানে, না হয় তা তৎক্ষণাৎ উপড়া ফেলে দেয় এবং তাতে যে ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত হয় জীবনে আর সেদিকে ফিরে তাকাতে সাহস করে না। কথার বেলায় এই উপড়ে ফেলাই হচ্ছে গোপন কথা প্রকাশ করা।

মেয়েরা অনর্গল কথা বলার ঝোঁকে নানা গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলে। মেয়েরা দুঃখে আত্মবিসর্জন দেয়, পুরুষেরা দুঃখ থেকে দূরে সরে এসে তাকে বাইরে থেকে দেখতে চেষ্টা করে। লেখক বলেছেন, ''যে তীক্ষ্ণ বেদনার আঘাতে মেয়েরা ভেঙে পড়ে, সে বেদনায় পুরুষ ভেঙে পড়ে না, সে সেই বেদনাকে মনের জারক রসে জীর্ণ করতে থাকে। তীব্রতম বেদনাকে সে সমস্ত জীবনের মধ্যে বা শিল্প সৃষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত করতে থাকে।''[৭]মেয়েদের কিন্তু কোনো অশ্রুই গভীর গহনে থাকে না, সবটাই বেরিয়ে আসে নয়ন পথে। বুকের শিরা ছিন্ন করে বেদনার ঊর্ধ্বে উঠে মেয়েরা কখনো কোনো কিছু ভাবতে শেখে নি। কিন্তু শেখে নি বলেই হয়তো সংসার চলছে এমন সহজ ভাবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই যে বৈপরীত্য এটি বিরোধী নয়। একজন চুপ করে থাকে, একজন কথা বলে — এই দুই বৈপরীত্য মিলিয়ে সংসারে একটি ঐকতান বেজে চলেছে। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক বিদ্যুতের গতিচক্র সম্পন্ন হলে যেমন আলো জলে তেমনি নারী ও পুরুষের এই বৈচিত্র্যই মানুষের জীবনকে এমন সুন্দর করেছে। মেয়েদের অন্তরে আগুন জ্বললে তা তৎক্ষণাৎ চোখের জলে নিভিয়ে ফেলে, আর না হয় তাতে পুড়ে মরে। কিন্তু পুরুষের অন্তরের আগুন নেভে না। আর তার অশ্রুও চোখে ঝরে না। আগুনের প্রতিবেশী রূপে অন্তরে বাস করে। এত প্রমাণ সত্ত্বেও লেখক মেনেই নিয়েছেন যে মেয়েরা কোনো কথা গোপন রাখতে পারে না।

পরিমল গোস্বামী তাঁর চারপাশের সমাজকে খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। সাধারণ মানুষের ছোটোখাটো কপটতা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর লেখায় কৌতুকপূর্ণভাবে ফুটে উঠত। তবে তাঁর ব্যঙ্গ কখনোই কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করত না, বরং তা ছিল এক ধরণের নির্মল কৌতুক। পরিমল গোস্বামীর মতে, রম্যরচনা কেবল হাস্যরস বা তামাশা নয়। পরিমল গোস্বামীর রম্যরচনা হলো এমন এক দর্পণ, যেখানে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে জীবনের গভীরতা প্রতিফলিত হয়। তাঁর ভাষায়, এটি পাঠককে মুগ্ধ করার পাশাপাশি একটি উপভোগ্য পরিবেশ তৈরি করে। তাঁর লেখাগুলিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রাধান্য থাকলেও সেখানে কল্পনার এক সূক্ষ্ম মিশেল থাকত। পরিমল গোস্বামীর রচনার একটি বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে তাঁর সমকালীন সাহিত্যিক বন্ধুদের কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী কিংবা 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডার বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁর কলমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে এই ধরণের ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক আড্ডার চমৎকার প্রতিফলন দেখা যায়। এটি নিছক হাসি-ঠাট্টা নয়, বরং এটি জীবনের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। যেখানে লঘু চালের আড়ালে অনেক সময় গভীর সামাজিক বা মানসিক সত্যকে উপস্থাপন করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১। 'ম্যাজিক লণ্ঠন', পরিমল গোস্বামী, পৃ. ৭৮
২। ওই, পৃ. ৮১
৩। 'রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ', পরিমল গোস্বামী, পৃ. ৭৮
৪। 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি', পরিমল গোস্বামী, পৃ. ৬৫
৫। 'রবীন্দ্রশিল্প প্রসঙ্গ', পরিমল গোস্বামী, পৃ. ৬২
৬। 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ি', পরিমল গোস্বামী, পৃ. ৬৪
৭। 'মেয়েরা কথা গোপন রাখতে পারে না', 'পরিমল গোস্বামী, পৃ. ১৩

সহায়ক গ্রন্থ:

১। গোস্বামী পরিমল, 'আষাঢ়ের দেশে', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৪
২। গোস্বামী পরিমল, 'যখন সম্পাদক ছিলাম', নবগ্রন্থনা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
৩। গোস্বামী পরিমল, 'সমগ্র স্মৃতি চিত্রণ', আনন্দ পাবলিকেশন, ২০১২
৪। গোস্বামী পরিমল, 'স্কুলের মেয়েরা', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৪

৫। রায়চৌধুরী বিভাস, ‘নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা’, প্রথম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮
৬। রায়চৌধুরী বিভাস, ‘নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা’, প্রথম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৮
৭। গোস্বামী পরিমল, ‘ইতস্তত’, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৪

—

Prantik Gabeshana Patrika